IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি ও নবকান্ত বরুয়ার কপিলিপরিয়া সাধু: দুই নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

পবিত্র রায়

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়, হোজাই, আসাম

সারকথা

তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে হলে একই গোত্রের দুই বা ততোধিক বিষয়ের মধ্যে তা করতে হয়। অর্থাৎ তুল্য বিষয় বা বস্তুগুলোতে অনেক বৈশাদৃশ্যের মধ্যেও কোথাও না কোথাও শাদৃশ্য থাকতে হবে। এই দিকটিকে মাথায় রেখেই আমরা বাংলা ও অসমীয়া ভাষায় লেখা দুটি নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসকে বেছে নিয়েছি বিশ্লেষণের জন্য। এই দুটি উপন্যাস হল মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' ও নবকান্ত বরুয়ার 'কপিলিপরিয়া সাধু'। মানিক বন্দোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের একজন প্রখ্যাত ঔপান্যাসিক। তাঁর লেখা 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে পদ্মাপারের জেলে-মাঝিদের জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে। ফলে এর মধ্যে আঞ্চলিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। অপর দিকে নবকান্ত বরুয়া অসমীয়া সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক। তাঁর লেখা 'কপিলিপরিয়া সাধু' উপন্যাসে কপিলি নদীর তীরবর্তী মানুষের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। ফলে এটিও আঞ্চলিক উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত। উভয় উপন্যাসে লৌকিক সংস্কার, লোকবিশ্বাস, বিভিন্ন সামাজিক রীতি-নীতির পরিচয় পাওয়া যায়। এরকম বিভিন্ন সমতার মধ্যেও অনেক অমিল খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের তুলনায় 'কপিলিপরিয়া সাধু' উপন্যাসে অধিক পরিমানে লোকসংস্কৃতির উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। আবার পদ্মাপারের আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ যেভাবে 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে পাওয়া যায়, সেভাবে 'কপিলিপরিয়া সাধু' উপন্যাসে পাওয়া যায় না।

সূচক শব্দ: লোকজীবন, লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার, মিথ, আঞ্চলিকতা, ভৌগোলিক পরিমণ্ডল।

১.০ ভূমিকা

'তুলনামূলক পদ্ধতি' হল একটি আন্তঃশৃঙ্খলামূলক *(Interdisiplinary)* তথ্য-বিশ্লেষণ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিটি বিভিন্ন শৃঙ্খলা বা বিষয়ের উপাদান বিশ্লেষণে প্রযুক্ত হয়। এই পদ্ধতি ঠিক কবে কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে উদ্‌ভূত হয়েছিল, সে নিয়ে সঠিক তথ্য জানা যায় না। তবে অনেকেই মনে করেন তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বকে কেন্দ্র করে এই পদ্ধতির উদ্ভব হয়। একই ভাষা-পরিবারের অন্তর্গত বিভিন্ন

আঞ্চলিক ভাষা বা পাশাপাশি অঞ্চলে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হয় এই পদ্ধতিতে। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন গ্রিম ভাতৃদ্বয়। তাঁরা জার্মান ভাষার সঙ্গে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের অন্যান্য ভাষার ধ্বনিতত্ত্বের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেন। তার মধ্য দিয়েই তাঁরা ধ্বনিবিচারের একটি সূত্র আবিষ্কার করেন, যা ভাষাতত্ত্বের জগতে 'গ্রীমস ল' নামে পরিচিত। গ্রীম ভাতৃদ্বয় পরবর্তীকালে ১৮২২ সালের দিকে তুলনামূলক পদ্ধতিকে লোকগাঁথা ও লোককথা বিচারে প্রয়োগ করেন।[১] সেই থেকে লোকসংস্কৃতির উপাদান বিশ্লেষণে তুলনামূলক পদ্ধতির যাত্রা শুরু হয়।

পরবর্তীকালে বিভিন্ন বিষয় বা শৃঙ্খলায় পদ্ধতিটি ব্যবহৃত হতে থাকে। স্বাভাবিক ভাবেই পদ্ধতিটি সাহিত্য বিশ্লেষণেও প্রযুক্ত হতে শুরু করে। বিশেষ করে সমগোত্রের একাধিক সাহিত্যিক উপাদান, ভিন্ন ভাষার সমজাতীয় সাহিত্যিক উপাদান, বিভিন্ন লেখকের সমজাতীয় সাহিত্যিক উপাদান ইত্যাদি বিশ্লেষণে তুলনামূলক পদ্ধতি ব্যবহৃত হতে থাকে। এই ভাবে তুলনামূলক সাহিত্যের ধারণা তৈরি হয়; তা থেকে ধারণাটি তুলনামূলক সাহিত্যতত্ত্বে রূপান্তরিত হয়।

তুলনামূলক পদ্ধতিকে বুঝতে হলে প্রথমে বুঝতে হবে তুলনা কাকে বলে। ল্যাটিন শব্দ *'comparare'* থেকে ইংরেজি *'compare'* শব্দটি এসেছে, যার অর্থ 'তুলনা'। সমালোচক তপন রায় তাঁর 'লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানে তুলনামূলক পদ্ধতি' নামক গ্রন্থে বিভিন্ন সমালোচকের মতামত বিচার করে 'তুলনা' ধারণাটির কতগুলি বিশেষ দিক চিহ্নিত করেছেন। সেগুলি নীচে উল্লেখ করা হল –

১· দুই বা ততোধিক উপাদান, ধারণা, বিষয় ও চরিত্রের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা যায়।

২· তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপাদানগুলির সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য নির্ণয় করা যায়।

৩· তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে একাধিক উপাদানের মধ্যে ভালো এবং খারাপ উপাদান খুঁজে বের করা যায়।

৪· তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি উপাদানের সঙ্গে অপর উপাদানের পার্থক্য তুলে ধরা যায়।

৫· তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে একাধিক উপাদানের সমতা নির্ণয় করা যায়।

৬· একাধিক উপাদানের গঠণগত, গুণগত বা বৈশিষ্ট্যগত বা চরিত্রগত, অনুপাতগত নির্দিষ্ট তথ্য অনুযায়ী ও নির্বাচিত সমধর্মী বিষয়ের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা যায়।[২]

উপরের বক্তব্য থেকে এটুকু বোঝা গেল যে, কোনো বিষয় বা বস্তর সঙ্গে অপর কোনো বিষয় বা বস্তুর তুলনা করতে হলে, কোনো না কোনো দিক দিয়ে তুলনবাচক বস্তু বা বিষয়দুটির মধ্যে মিল থাকতে হবে। কোনো মিল না থাকলে তুলনার প্রয়োজন হয় না। এই দিকগুলো মাথায় রেখেই নবকান্ত বরুয়ার 'কপিলিপরিয়া সাধু' এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসদুটিকে তুলনামূলক বিশ্লেষণের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। তবে মূল বিষয়ে প্রবেশ করার আগে আমাদের এই গবেষণা-প্রকল্পের পরিকল্পনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেওয়া যাক।

২·০· গবেষণার সুযোগ ও উদ্দেশ্য

নবকান্ত বরুয়ার 'কপিলিপরিয়া সাধু' এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' দুটো উপন্যাসই প্রায় একই গোত্রের, দুটোই নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস। তাই উভয়ের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। যেমন উভয় উপন্যাসের একটি আঞ্চলিক পরিসর আছে, সেই সঙ্গে উভয় উপন্যাসই নদীকেন্দ্রিক; আবার উভয় উপন্যাসের জনজীবন একই ভাবে নদীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। আলোচ্য দুটি উপন্যাসের মধ্যে যে-সমস্ত দিকে মিল আছে সেগুলো দেখানো

আমাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। তার পরে উভয় উপন্যাসের মধ্যে যে-সমস্ত অমিল আছে, সেগুলো বিশ্লেষণ করা আমাদের দ্বিতীয় তথা প্রধান উদ্দেশ্য।

৩·০· তথ্য পর্যালোচনা

তুলনামূলক বিশ্লেষণের দিক থেকে তথ্যের অপ্রতুলতা রয়েছে। তবে স্বতন্ত্র ভাবে উভয় উপন্যাস নিয়ে ইতিমধ্যে প্রচুর আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। সেই সমস্ত আলোচনা আমাদের বিভিন্ন দিক থেকে সাহায্য করবে। যেমন উভয় উপন্যাসের গঠন-কৌশল, গোষ্ঠীজীবন, আঞ্চলিতা সম্পর্কে ইত্যাদি বিষয়ভিত্তিক সমালোচনা থেকে প্রয়োজনীয় মতামতগুলো অনুসরণ করে আমাদের দৃষ্টিকোণ নির্দিষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৪·০· অনুসৃত পদ্ধতিবিদ্যা

বর্তমান রচনাটি সম্পূর্ণ করার জন্য এই গবেষণার উপযোগী যে-সমস্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, সেগুলো নিম্নরূপ —

৪·১· তথ্য সংগ্রহ: প্রাথমিক তথ্যের জন্য আলোচ্য উপন্যাসদুটি ও গৌণ তথ্যের জন্য উভয় উপন্যাস সম্পর্কিত আলোচনা, সমালোচনা মূলক গ্রন্থ প্রভৃতির অনুসরণ করেছি। এক্ষেত্রে আমাদের অনুসৃত পদ্ধতি হল গ্রন্থাগার-পঠন মূলক পদ্ধতি।

৪·২· তথ্য বিশ্লেষণ: তথ্য বিশ্লেষণের জন্য মূলত অনুসৃত হয়েছে তুলনামূলক পদ্ধতি। তবে সহায়ক হিসাবে ভৌগোলিক তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, আখ্যানতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

৫·০· আলোচ্য লেখকদ্বয়ের সংক্ষীপ্ত পরিচয়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট উপন্যাস। অপর দিকে নবকান্ত বরুয়ার 'কপিলিপরিয়া সাধু' অসমীয়া সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট উপন্যাস। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' এবং নবকান্ত বরুয়ার 'কপিলিপরিয়া সাধু' — দুটোই নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস, সেই সঙ্গে আঞ্চলিক লক্ষণাক্রান্ত। নবকান্ত বরুয়ার 'কপিলিপরিয়া সাধু' উপন্যাসে কপিলি নদীর তীরবর্তী মানুষের জীবন প্রতিফলিত হয়েছে। অপর দিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে পদ্মাতীরবর্তী মানুষের জীবন প্রতীকায়িত হয়েছে। সুতরাং উভয় উপন্যাসের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। আবার দুজন ঔপন্যাসিক ভিন্ন অঞ্চলের, সেই সঙ্গে ভিন্ন ভাষার লেখক হওয়ার দরুন উভয় উপন্যাসে অনেক অমিলও বর্তমান। তবে মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে লেখকদ্বয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৫·১· মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়: বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী মাত্রই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) সম্পর্কে কম-বেশি জানেন। ফলে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় দিয়ে অযথা প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা উচিত হবে না বলেই মনে হয়। এখানে শুধু এটুকু বলতে চাই যে, রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কথা সাহিত্যে যে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়, তাঁদের মধ্যে মানিক বন্দোপাধ্যায় অন্যতম। তাঁর প্রকৃত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তবে তিনি সাহিত্যজগতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং সেই নামেই পরিচিত। আমরা সবাই জানি যে,

তিনি বাংলা কথাসাহিত্যকে এক বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। তাঁর রচনার একটি বিশেষ দিক হল, তিনি মানুষের আদিম জৈবিক বৃত্তি-প্রবৃত্তিকে তাঁর গল্প-উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন, মানব-মনের অতল গহ্বরে তিনি পারি দিয়েছেন। তবে আমাদের আলোচ্য 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি তাঁর একটি ব্যতিক্রমী রচনা। মার্ক্সীয় তত্ত্বের কিছুটা অনুসরণ থাকলেও পদ্মাপারের জীবন ও সংস্কৃতি উপন্যাসটিকে ভিন্ন মাত্রা দান করেছে।

৫·২· নবকান্ত বরুয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয়: নবকান্ত বরুয়া অসমীয়া সাহিত্যের একাধারে কবি, শিশুসাহিত্যিক, কথাসাহিত্যিক, অনুবাদক ও সমালোচক। তিনি মূলত কবি হিসাবে অধিক পরিচিত হলেও, উপন্যাস সাহিত্যেও তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। তিনি মাত্র সাতটি উপন্যাস লিখেছেন। কিন্তু সংখ্যায় কম হলেও সাহিত্যগুণে ভরপুর এই সব উপন্যাস অসমিয়া সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। নবকান্ত বরুয়ার জন্ম হয় ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে। তার পিতা নীলকান্ত বরুয়া কলাকায় অ্যাসেমব্লি কলেজে পড়াশুনা করেছেন। তিনি প্রথম জীবনে বিদ্যালয়ের সহ-পরিদর্শক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করলেও পরবর্তীকালে শিক্ষকতাকে বেছে নিয়ে নগাও-এ বসবাস করা শুরু করেন। তিনি বাড়িতে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সংগীতের পরিবেশ গড়ে তুলেছিলেন। তাই তাঁর চার পুত্র দেবকান্ত, শিবকান্ত, জীবকান্ত ও নবকান্ত –সকলেই সাহিত্যানুরাগী হয়ে উঠেছিলেন।

নবকান্ত বরুয়ার জন্ম গুয়াহাটিতে হলেও পিতার কর্মস্থল নগাঁও-এই তাঁর শৈশব ও কৈশোর কাল কাটে। স্কুলের শিক্ষা শেষ করে নবকান্ত বরুয়া কটন কলেজে ভর্তি হন, কিন্তু অসুস্থতার জন্য সেই শিক্ষা স্থগিত হয়ে যায়। পরবর্তীকালে তিনি উচ্চ-শিক্ষার জন্য শান্তিনিকেতনে চলে যান। সেখানে তিনি বিভিন্ন জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে আসেন, যথা - সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র সেন, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামকিঙ্কর বেজ প্রমুখ। সুতরাং তার জীবন ও সাহিত্যে বাংলা সাহিত্যের প্রভাব পড়বে এটা স্বাভাবিকই। বিশেষত তিনি রবীন্দ্রকবিতার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। যাই হোক কর্ম জীবনে তিনি অধ্যাপক ছিলেন। পড়ে কটন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি অনেক কবিতা ও গান রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে 'হে অরণ্য হে মহানগর' *(১৯৫১)*, 'এটি দুটি এঘারটি তরা' *(১৯৫৭)*, 'যতি আরু কেইটামান স্কেচ' *(১৯৬০)*, রত্নাকর *(১৯৮৬)* প্রভৃতি প্রধান। আমাদের আলোচ্য 'কপিলিপরিয়া সাধু' *(১৯৫২)* তাঁর প্রথম উপন্যাস। এছাড়া ককাদেউতার হাড় *(১৯৭৩)*, গড়মা কুঁওরী *(১৯৮০)* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'ককাদেউতার হাড়' উপন্যাসের জন্য ১৯৭৫ সালে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়াও তিনি পদ্মভূষণ সহ আরও অনেক সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন।

৬·০· আলোচ্য দুই উপন্যাসের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আলোচ্য দুটি উপন্যাসই নদীকেন্দ্রিক। কিন্তু দুটো উপন্যাসের মধ্যে যেমন মিল আছে, তেমনি অমিলও বর্তমান। আমরা বিভিন্ন দিক ধরে উপন্যাসদুটির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে পারি। যেমন আখ্যান, আঞ্চলিকতা, সমাজ জীবন, লোকসংস্কৃতি, ভাষা ইত্যাদি।

৬·১· আখ্যান নির্মাণ: 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের আখ্যান নির্মিত হয়েছে, পদ্মাপারের ধীবর শ্রেণির সমাজকে কেন্দ্র করে। এই উপন্যাসের প্রথম দিকে পদ্মাপারের মাঝিদের জীবন-সংগ্রামই প্রধান বিষয় হিসাবে দেখা দিয়েছে। উপন্যাসের প্রথম দিকে গোষ্ঠিজীবনই প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু ক্রমশ গোষ্ঠীজীবন থেকে কাহিনি কুবের মাঝির ব্যক্তি-জীবনে প্রবেশ করেছে এবং পরবর্তী কাহিনি কুবেরের

জীবনকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। কিন্তু একথাও ঠিক যে, কুবের ব্যক্তিচরিত্র হিসাবে প্রাধান্য পেলেও, তার গোষ্ঠীজীবন কিন্তু একেবারে গৌণ হয়ে যায়নি। কুবের যে জেলেমাঝি, তার মধ্য দিয়ে যে, পদ্মাপারের মাঝিদের জীবনকে উপন্যাসকার তুলে ধরতে চেয়েছেন, সেটাও অপ্রকাশিত থাকেনি। অর্থাৎ কুবের একদিকে ব্যক্তি আবার অন্য দিকে সে তার গোষ্ঠীসমাজের প্রতিনিধিও।

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বৃত্তিকেন্দ্রিক জীবন। সেই বৃত্তিজীবী মানুষের প্রতিনিধি কুবের। ইলিশের মরশুমে মাছ ধরতে না পারলে তাদের জীবিকা নির্বাহ হয় না। সেই বৃত্তিজীবনের মধ্যেও পরিবর্তন এসেছে। তার প্রেক্ষাপট আলাদা। প্রকৃতি থেকে সংগ্রহজীবী কুবের ময়নাদ্বীপে গিয়ে উৎপাদকে *(কৃষক)* পরিণত হয়েছে। শুধু কুবের নয়, তার আগে আরও অনেকে সেখানে গিয়ে বৃত্তি পরিবর্তন করেছে। পাশাপাশি কিছু মুসলমান কৃষকও গিয়েছে, তাদের হয়তো বৃত্তি পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু তারা না গেলে অনভিজ্ঞ ধীবর শ্রেণি কৃষিকাজ শিখবে কী করে? তাই হয় তো কৃষিকাজে অভিজ্ঞ মানুষদেরও সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এক দিকে কৃষি-উৎপাদন, অপর দিকে মানব-উৎপাদন -উভয় প্রকার উৎপাদনই ময়নাদ্বীপের মূল উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে। এই পরিবর্তনের মধ্যেই সম্পৃক্ত হয়ে আছে মার্কসীয় তত্ত্ব।

এবার 'কপিলিপরিয়া সাধু' উপন্যাসের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। কপিলি একটি নদীর নাম। 'পরিয়া' শব্দের বাংলা অর্থ হল 'পারের'; 'সাধু' শব্দের অর্থ লোককথা বা জনশ্রুতিমূলক গল্প, উপকাথাও বলা যেতে পারে। সুতরাং বাংলা ভাষায় উপন্যাসটির নাম হতে পারে 'কপিলিপারের উপকথা' বা 'কপিলিপারের উপাখ্যান'। নামের দিক থেকে তাই তারশঙ্করের 'হাসুলি বাঁকের উপকথা'-র সঙ্গেই এর সাযুজ্য আছে। যাই হোক যেকোনো নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসের সঙ্গেই আলোচ্য উপন্যাসখানির তুলনা হতে পারে। যেমন বিভুতিভূষনের 'ইছামতী', অদ্বৈত মল্ল বর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' কিংবা দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' বা 'তিস্তাপুরাণ' প্রভৃতি। এগুলোর মধ্য থেকে আমরা বেছে নিয়েছি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'-কে।

'কপিলিপরিয়া সাধু' উপন্যাসেও কপিলি নদীর তীরে বসবাসকরী মানুষের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। এখানেও আমরা পাব নদীসম্পৃক্ত জীবনগাঁথা; সমাজ-সংস্কৃতির কথা; কপিলির বন্যায় মানুষ কীভাবে দুঃখ-দুর্দশায় পতিত হয়, তার কথা। জলবাহিত বিভিন্ন রোগে মানুষের দুর্দশার সীমা থাকে না। আবার সেই বন্যার ফলে পলি জমে, মাটি উর্বর হয়, তার ফলে ভালো ফসল উৎপাদন হয়। তাই মানুষ শত দুর্দশার মধ্যে পড়লেও কপিলির পার ত্যাগ করে যায় না। তবে কপিলির পার ত্যাগ করে না যাওয়ার একটি বিশেষ কারণও উল্লেখ করেছেন উপন্যাসকার। কপিলিকে তিনি বিশেষ চরিত্রে উন্নীত করেছেন। কপিলি যেন সেই অঞ্চলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কেউ তাঁর কোল থেকে চলে যেতে চাইলে তিনি তাকে স্বপ্নে ভয় দেখিয়ে যেতে নিষেধ করেন। এভাবেই তৈরি হয়েছে নদীমিথ; বলা যায় উপকথার বিনির্মাণ, যা পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে দেখা যায় না।

'কপিলিপরিয়া সাধু' উপন্যাসেও কিছু জেলে মানুষের কথা আছে। কিন্তু তাঁদের গোষ্ঠীজীবন মুখ্য হয়ে ওঠেনি। এই উপন্যাসে মুখ্য হয়ে উঠেছে একটি চরিত্রের সঙ্গে কপিলি নদীর বিশেষ সম্পর্কের গাঁথা। সে চরিত্রটি হল রূপাই, যে কপিলির বানে ভেসে এসেছে। তাঁর পিতা-মাতার কোনো পরিচয় জানা যায় না। বলতে গেলে সে যেন কপিলিরই সন্তান। তাই বাল্যকাল থেকেই কপিলির প্রতি তার গভীর টান। সেই টান পরিণত বয়েসেও এতটুকু ম্লান হয়ে যায়নি। কপিলির কোলে আবাল্য লালিত রূপাই নদীর সঙ্গে যেন কথা বলে। সুতরাং কপিলিপারের উপকথার লক্ষ্য আলাদা, 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের তাত্ত্বিক অনুসরণ এখানে নেই। এখানে আছে নতুন করে মিথ গড়ে তোলার কথা, যার সঙ্গে দেবেশ

রায়ের 'তিস্তাপুরাণ' উপন্যাসের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সেখানেও দেখা যায় বুড়িমার সঙ্গে তিস্তা নদীর মিথ গড়ে উঠছে, নতুন উপকথার বিনির্মাণ হচ্ছে। সুতরাং আলোচ্য দুই উপন্যাসে আখ্যান নির্মাণে মিল অপেক্ষা অমিলের পাল্লাই ভারি।

৬·২· আঞ্চলিকতা: যেকোনো উপন্যাসের একটি আঞ্চলিক বা ভৌগোলিক পরিসর থাকে। তার মধ্যেও বিশেষ কিছু উপন্যাসে সেই পরিসর যেন খুবই নিবিষ্ট হয়ে ওঠে সমাজ জীবনে। একটি বিশেষ পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তখন তাকে আঞ্চলিক উপন্যাস হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। তবে শুধু আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতাই এই ধরনের উপন্যাসের মূল বৈশিষ্ট্য নয়। কেন না, তা হলে অনেক উপন্যাসকেই আঞ্চলিক উপন্যাসের তকমা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেটা করা হয় না। কারণ এই ধরনের উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বিশেষ ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বসবাসকারী মানুষের উপরে সেই অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশের সামগ্রিক প্রভাব। তাদের জীবন ও জীবিকা ঐ ভৌগোলিক পরিবেশের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হবে। সেই অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতিরও বিশিষ্টতা থাকবে। ব্যক্তি চরিত্র নয়, গোষ্ঠীচরিত্রই নায়কের স্থান গ্রহণ করে। এই সব বৈশিষ্ট্য থাকলে একটি উপন্যাস আঞ্চলিক হয়ে ওঠে। আলোচ্য দুটো উপন্যাসই যে এর সব গুলো শর্ত পূর্ণ করতে পেরেছে, এমনটা জোর দিয়ে বলা যায় না; তবে কিছুটা বিচ্যুতি থাকলেও এগুলোকে আঞ্চলিক উপন্যাস হিসাবে ধরে নেওয়া যায়।

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে পাই পদ্মাপারের কেতুপুর গ্রামের কথা। এক বিশেষ জনগোষ্ঠী ধীবর-সমাজকে ঘিরে কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। আঞ্চলিক ভাষা ও লোকসংস্কৃতির উপাদানও উপন্যাসে বিদ্যমান। মূল ভৌগোলিক পরিসর কেতুপুর, প্রসঙ্গক্রমে পার্শ্ববর্তী আরও দু-একটি গ্রামের কথা এসেছে, যেখানে কাজে কর্মে কেতুপুরের মানুষকে যেতে হয়। তাদের জীবন এই অঞ্চলের আঞ্চলিক গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তারা সাধারণত বাইরের দুনিয়ায় যায় না। বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে হোসেন মিয়ার। এখানকার মানুষ তাঁর কাছেই বাইরের দুনিয়ার গল্প শোনে। কিন্তু তাদের আর যাওয়া হয় না, সেই সব অঞ্চলে। সুতরাং উপন্যাসে বর্ণিত সমাজ জীবনের সঙ্গে বাইরের দুনিয়ার বিশেষ কোনো যোগ নেই। সেদিক থেকে একে আঞ্চলিক উপন্যাস হিসাবে চিহ্নিত করতে বাঁধা নেই। যদিও উপন্যাসের কাহিনি পরবর্তীতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে এবং শেষে হোসেন মিঞার ময়নাদ্বীপে পারি দিয়েছে, তবু জেলেমাঝিদের আঞ্চলিক জীবন উপেক্ষিত হয়নি। বরং এর মধ্য দিয়ে জেলেমাঝিদের জীবনসংগ্রাম তথা কঠিন-কঠোর পরিস্থিতির কথাই বিশেষ ভাবে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে।

অপর দিকে 'কপিলিপরিয়া সাধু' উপন্যাসেও নগাঁও জেলার মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া কপিলি পারের ভূরবান্ধা গ্রামে বসবাসকারী মানুষের জীবনগাঁথা বর্ণিত হয়েছে। গ্রামের মানুষদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে সুদৃঢ় করার জন্য এই অঞ্চলের প্রাচীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য ও সেই সব রাজবংশের বর্তমান পুরুষদের কথা তুলে ধরেছেন উপন্যাসকার। এই সব ইতিকথা থেকেই বোঝা যায়, এখানকার মানুষ সুদীর্ঘ কাল এখানে বসবাস করছে। কপিলির বন্যার প্রকোপ সহ্য করেও তারা মাটি আঁকড়ে আছে। এভাবেই উপন্যাসকার আঞ্চলিক প্রতিবেশকে দৃঢ় করে তুলেছেন। সেই সঙ্গে এখানকার মানুষের মধ্যে প্রচলিত লোকবিশ্বাস, খাদ্যাভ্যাস, লোকপ্রচলিত উপকথা, রূপকথা ইত্যাদিও তুলে এনেছেন। এখানকার মানুষ কাজে কর্মে নগাঁও শহরে গেলেও, তাদের আঞ্চলিক জীবন তাতে কোনোভাবে প্রভাবিত হয়নি। আধুনিক সভ্যতা বা নগরজীবনের অভিঘাত তাদের আঞ্চলিক সত্তাকে নষ্ট করতে পারেনি। সুতরাং এই উপন্যাসও তার আঞ্চলিক চরিত্র গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে বলা যায়।

৬·৩· লোকজীবনে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব: আঞ্চলিক উপন্যাসের একটি বিশেষ শর্ত হল লোকজীবনে ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব ও তার সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ। পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই যে, পদ্মাপরের জেলেমাঝিদের জীবন পদ্মানদীর উপরেই নির্ভরশীল। পদ্মার বুকের মাছ ধরেই তাদের জীবিকা নির্বাহ হয়। পদ্মার সঙ্গে তাদের জীবন এতটাই জড়িয়ে আছে

যে, পদ্মাকে তাদের জীবন থেকে সরিয়ে দিলে, তাদের সমাজকাঠামোর অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাদের দৈনন্দিন জীবনের চালচলন, সামাজিক নিয়ম-নীতি প্রায় সবই নদীকেন্দ্রিক। বর্ষার সময় ইলিশের মরশুম, এই সময় একটি রাতও তারা নষ্ট করতে চায় না। কারণ এই সময় যা রোজগার হয়, অন্য সময়ে তা পাওয়া যায় না। তখন কারও পুকুর যদি জমা নেওয়া থাকে, তবেই বছরের বাকি সময় তারা চলতে পারে। যারা নিতে পারে না, তাদের কেবল এই বর্ষকালটাই ভরসা। অর্থাৎ পদ্মা তথা প্রকৃতির বুক থেকে জীবনের রসদ সংগ্রহ করেই তাদের জীবন চলে।

অপর দিকে কপিলিপারের মানুষদের জীবন এরকম কপিলির মাছের উপর নির্ভর করে চলে না। তাদের উপরে কপিলির প্রভাব অন্যরকম। কপিলি তাদের সন্তানের মতো লালন করে। পিপাসার জল দেয়, বর্ষাকালে বন্যায় জমিতে যে পলি পরে, তাতে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য, বিয়ে সবই কপিলির মধ্য দিয়ে চলে। এখানকার মাটি রুক্ষ, পথঘাট তৈরি করা খুব মুস্কিল। তাই যোগাযোগের একমাত্র উপায় জলপথ। মোট কথা কপিলি ছাড়া তাদের জীবন চলে না। আবার কপিলির এত কিছু উপকারের পরেও কিন্তু মানুষ সর্বদা সুখী থাকতে পারে না। কেন না, প্রতি বছরের বন্যায় মানুষের দুর্ভোগেরও সীমা থাকে না। গ্রামের পর গ্রাম, মাঠের পর মাঠ জলে ডুবে যায়, মানুষের ঘর-বাড়ি, খেত-খামার তছনছ হয়ে যায়। তাই কেউ কেউ কপিলিপার ত্যাগ করার কথা ভাবে। কিন্তু কপিলি স্বপ্নাদেশ দিয়ে জানান যে, সে যেখানেই যাক, কপিলি তার পিছু ছাড়বেন না। অর্থাৎ কপিলি কেবল নদী হয়ে থাকেন না, তখন তিনি হয়ে ওঠেন অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

সুতরাং আলোচ্য দুই উপন্যাসে মানুষের উপরে ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক পরিবেশের সামগ্রিক প্রভাব লক্ষণীয়, প্রকৃতি মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৬.৪· লোকসংস্কৃতির উপাদান: কোনো বিশেষ অঞ্চলের সমাজকে কেন্দ্র করে উপন্যাস লিখিত হলে, তার মধ্যে লোকসংস্কৃতির উপাদান যে থাকবে, তা বলাই বাহুল্য। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসও তার ব্যতিক্রম নয়। নদীকেন্দ্রিক জীবন, তাই নদীতে চলাচল করার নানান রীতি-নীতি তারা মেনে চলে। কেউ বিপদে পড়ে কোনো মাঝিকে নদী পার করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলে, সেই মাঝি শত ব্যস্ততা থাকলেও সেই অনুরোধ রক্ষা করে। কেন না, আজ সে যদি পার করে না দেয়, তাহলে একই রকম বিপদে পড়লে, তাকেও কেউ হয়তো পার করে দেবে না। এভাবে অনুরোধ রক্ষা করাটা সকলের পালনীয় নিয়মে পরিণত হয়েছে।

নদীতে মাছ ধরতে ধরতে মাঝিরা অপরের সঙ্গে সংবাদ আদান প্রদান করে। যেমন কুবের মাঝি যদুকে জিজ্ঞাস করেছে - 'যদু হে এ এ এ মাছ কিবা?' উত্তরে যদু বলেছে -'জবর'[৩]। এর মধ্য দিয়ে লোকসাংবাদিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। সন্তান জন্মালে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের থেকে আলাদা করে পোয়াতিকে আতুর ঘরে থাকতে দেওয়া হয়। কুবেরের ছেলে জন্মালে তার স্ত্রী মালাকেও আতুর ঘরে রাখা হয়েছে। এও এক ধরনের লোকসংস্কার। এরকম আরও কিছু লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়। লোকসংগীত, ছড়া ইত্যাদিরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

অপর দিকে তুলনামূলক ভাবে 'কপিলিপরিয়া সাধু' উপন্যাসে লৌকিক উপাদান অধিক পরিমানে পাওয়া যায়। উপন্যাসের নামের মধ্যে 'সাধু' অর্থাৎ লোককথার অনুষঙ্গ আছে। কাহিনিতেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। উপন্যাসকার কপিলি নদীকে দৈবীসত্তা রূপে চিত্রিত করেছেন, তার সঙ্গে রুপাই চরিত্রের গভীর সম্পর্ক তাকে আরও অন্য মাত্রা দান করেছে, যে-কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। তাছাড়াও কপিলির সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে কমলাকুমারীর উপাখ্যান, কমলাকুমারী মানুষ ছিল, এখন কপিলির বুকে 'জলকুমারী' হয়ে আছে। এভাবে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন মিথ বা উপকথা। এছাড়া লৌকিক খাদ্যাভ্যাস

যেমন মাছপোড়া, পন্তাভাত ইত্যাদির কথা পাওয়া যায়। ভূত-প্রেতে বিশ্বাস, ঝার-ফুক, তুকতাক প্রভৃতি নানা ধরনের লোকবিশ্বাসের কথা উপন্যাসে পাওয়া যায়।

৬·৫· আখ্যানের ভাষা: আঞ্চলিক উপন্যাসে সাধারণত দুই ধরনের ভাষা প্রয়োগ দেখা যায়। একটি হল বর্ণনার ভাষা, যা সাধারণত মান্য ভাষা হয়ে থাকে। অপরটি বিভিন্ন চরিত্রের ভাব-বিনিময়ের ভাষা, যা সাধারণত আঞ্চলিক হয়ে থাকে। ফলে আখ্যানটি দুটি স্তরে বিন্যস্ত হয় -ঘটনা বর্ণনা, অপরটি কথোপকথন। কখনও আরও বেশি স্তরে বিস্তৃতি লাভ করতে পারে, যদি বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের অবস্থান থাকে।

পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে আমরা দুই ধরনের ভাষাস্তর দেখতে পাই। বর্ণনার ক্ষেত্রে বাংলা সাধু ভাষা এবং চরিত্রের মুখে আঞ্চলিক ভাষা। অর্থাৎ উপন্যাসকার কাহিনি বর্ণনা করেছেন সাধু গদ্যে এবং বিভিন্ন চরিত্রের মুখে দিয়েছেন পদ্মাপারের আঞ্চলিক কথ্য ভাষা। যেমন -

বর্ণনার ভাষা — "কুবেরের পিসি আর তার বড়ো মেয়ে গোপি কুবেরকে দেখিয়াই চেঁচামেচি করিয়া কাছে আসিয়াছিল। কুবের কারও সঙ্গে কথা বলিল না। লম্বা হইয়া পিসির বিছানায় শুইয়া পড়িল।"[৪]

সংলাপ - "… শুলি যে ধন? বউ ওদিকে পোলা বিয়াইয়া সারছে, দেইখা আয়।"[৫]

অপর দিকে 'কপিলিপরিয়া সাধু' উপন্যাসের ভাষা-প্রয়োগ একটু ভিন্ন ধরনের। অসমীয়া মান্য ভাষা এবং আলোচ্য অঞ্চলের কথ্য ভাষার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। তাই এক্ষেত্রে সংলাপে আঞ্চলিকতার ছাপ নেই বললেই চলে। তবে এ-অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের বসবাস হওয়ায় সংলাপে অন্য দু-একটি ভাষার প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন রূপাই হিন্দিভাষী জেলেদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আধা-অসমীয়া ও আধা-হিন্দি ভাষায় জিজ্ঞাসা করে -'তোমালোক *(তোমরা)* ভাত খায়েগা নাই কিয়' *[*বলতে চাইছে -'তোমরা ভাত খাও না কেন?'*]*। উত্তরে একজন জেলে বলেছে -'আভি কোন পকায়েগা - রাতমে কাম নেহি হায় - তব পকাকে খায়েগা।'[৬]

আবার রূপাই যখন দীনবন্ধু উকিলের *(বাঙালি)* বাড়িতে গিয়ে উঠেছিল, তখন উকিলবাবু তাকে বাংলাতে জিজ্ঞাসা করেন -'কিরে রূপাই, বৃত্তি পাবি তো?' উত্তরে রূপাই আধা-বাংলা আধা-অসমীয়াতে বলে 'পাম আইগা' *(*বলতে চেয়েছে -'আজ্ঞে পাব'*)*[৭]। দীনবন্ধু উকিলও অসমীয়া ভাষা ঠিকঠাক বলতে পারেন না। তিনি অসমীয়া ভাষায় কথা বলতে গিয়ে বাংলা-অসমীয়া মিশ্রিত করে কথা বলেন। এভাবে উপন্যাসে বিভিন্ন ভাষা ব্যবহারের ফলে ভাষায় বিভিন্ন স্বর ও স্তর তৈরি হয়েছে। যে-কোনো অঞ্চলেই একাধিক ভাষা বলা মানুষ থাকতে পারে। হাটে-বাজারে এরকম অনেক মানুষকেই দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন ভাষার মানুষ যখন একে অপরের সঙ্গে কথা বলে, তখন এরকম মিশ্র ভাষার প্রয়োগ নানা স্থলে দেখা যায়। এই ধরনের ভাষা প্রয়োগ উপন্যাসটিকে এক ভিন্ন মাত্রা দান করেছে।

৭·০· শেষকথা

উপরে বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি'-র সঙ্গে অসমীয়া সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট উপন্যাস 'কপিলিপরিয়া সাধু'-র তুলনামূলক বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হল। উভয় উপন্যাসের বিভিন্ন দিক যেমন, আখ্যান গঠন, আঞ্চলিকতা, সমাজজীবন, লোকসংস্কৃতির উপাদান, ভাষা ইত্যাদি ধরে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে দেখা গেল যে, উভয় উপন্যাসে অনেক উপাদান একই রকম ভাবে বর্তমান থাকলেও উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্যও আছে। উভয় লেখকের দৃষ্টিকোণ ভিন্ন, ভাষা এবং অঞ্চলও ভিন্ন। তাই তাঁদের চিত্রিত আখ্যান ও পরিবেশের মধ্যে ভিন্নতা থাকাটাই স্বাভাবিক। তবে যেহেতু

উভয় লেখকই নদীকেন্দ্রিক সমাজজীবনের আখ্যান রচনা করেছেন, তাই উভয়ের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করার আগ্রহ জাগাটাই স্বাভাবিক। সেই আগ্রহ থেকেই বর্তমান নিবন্ধের অবতারণা।

সূত্রনির্দেশ

১· তপন রায়, লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানে তুলনামূলক বিশ্লেষণ, অঞ্জলি পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১০, পৃষ্ঠা – ৫৮।

২· তদেব, পৃষ্ঠা – ৭৩

৩· মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মানদীর মাঝি, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৩৬, সংশোধিত পুনর্মুদ্রণ -২০০৯ পৃষ্ঠা – ৮।

৪· তদেব, পৃষ্ঠা –১৬।

৫· তদেব, পৃষ্ঠা – ১৬।

৬· নবকান্ত বরুয়া, কপিলিপরিয়া সাধু, লয়ার্ছ বুকষ্টল, গুয়াহাটি, ১৯৫৩, ষষ্ঠ সংস্করণ – ২০০৭, পৃষ্ঠা – ৬।

৭· তদেব, পৃষ্ঠা – ১৩।

সহায়ক গ্রন্থ

বাংলা

১· চক্রবর্তী, সুমিতা, উপন্যাসের বর্ণমালা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৮, ২য় সংস্করণ – ২০০৩।

২· চট্টোপাধ্যায়, হীরেন, সাহিত্য প্রকরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, ৪র্থ সংস্করণ – ১৪১৩।

৩· মজুমদার, সমরেশ, পদ্মানদীর মাঝি: পরিমিতি ও সৌষম্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ৪র্থ সংস্করণ – ২০০৪।

৪· মুখোপাধ্যায়, বিমলকুমার, মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্ব, দে'জ, কলকাতা, ২০০৬, ৩য় সংস্করণ – ২০১৮।

অসমীয়া

১· ডেকা বুজরবরুয়া, পল্লবী, তুলনামূলক সাহিত্যতত্ত্ব, বনলতা, গুয়াহাটি, ২০১৩।

২· ঠাকুর, নগেন, এশ বছরর অসমীয়া উপন্যাস, জ্যোতি প্রকাশন, গুয়াহাটি, ২০০০।

৩· নেওগ, মহেশ্বর, অসমীয়া সাহিত্যর রূপরেখা, চন্দ্র প্রকাশ গুয়াহাটি, ২০০৮।

৪· বরা, হেম ও বরা, পূর্ণ (সম্পাঃ), নবকান্ত বরুয়া: জীবন আরু কর্ম, বরুয়া এজেন্সি, গুয়াহাটি, ১৯৯০।